তথ্যপ্রযুক্তির আকাশে কালো মেঘ

ইমদাদুল হক

আজকের দিনে দেশের অগ্রগতিতে যেকোনো খাতের চেয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অবদানই সবচেয়ে বেশি। অবকাঠামোর চেয়ে উপরিকাঠামোর উন্নয়নে এ জৌলুস ইতোমধ্যেই নজর কেড়েছে তরুণ প্রজন্মের। সরকারি সহায়তার চেয়ে ব্যক্তি-উদ্যোগেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেশের আইসিটি খাত। কিন্তু দুয়েকটি ঘটনায় প্রযুক্তির মুক্ত আকাশে চলছে মেঘের ঘনঘটা। তথ্যপ্রযুক্তির আকাশে যেনো জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ।

অনলাইন অ্যাক্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের সংশোধন এবং গ্রাহক পর্যায়ে ব্যান্ডউইডথের দাম না কমিয়ে রফতানি চুক্তিসহ বেশ কিছু ঘটনায় ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের শেষ সময়ে তাদের সব অর্জনই বুমেরাং হতে বসেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প' শব্দটি নিছক কুহক না শব্দের মায়াজাল– তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চারপাশ এত কালো হয়ে এসেছে যেনো প্রযুক্তির সুধায় বিকশিত এ জনপদ এখন ঘরের খিড়কি-জানালা লাগাতে ব্যস্ত।

তবে আশার কথা, তীব্র ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেতে অবশেষে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সাইবার অপরাধী ধরতে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের। কিন্তু নির্বাচন সামনে রেখে সামাজিক যোগাযোগ গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা, সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে পুলিশকে সরাসরি মামলা করা ও পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া, কয়েকটি ধারা অজামিনযোগ্য করা এবং আমলযোগ্য নয় এমন অপরাধকে আমলযোগ্য হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করায় এ অগ্রযাত্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত সুধীজনেরা। প্রযুক্তিবোদ্ধারা মনে করছেন, এটি হচ্ছে আরেকটি কালাকানুন। এ আইন পাস হলে আইনের অপব্যবহার যেমন বাড়বে, একই সাথে শ্লথ হয়ে যাবে প্রযুক্তির জয়রথ। আর আইনজীবীদের আশঙ্কা, সংশোধিত আইন কার্যকর হলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হবে এবং বাড়বে শুধু মত প্রকাশের জন্য হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনা।

আইন সংশোধনের পটভূমি

কয়েক মাস ধরে সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহার করে সরকারবিরোধী তথ্য ও ছবি প্রচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকেও এ অভিযোগ একেবারে অমূলক নয় বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, ব্যাপক সমালোচনার মুখে অনলাইন অ্যাক্টের খসড়া বাস্তবায়নের বিষয়টি পিছিয়ে গেলেও একটু ভিন্ন পথে হাঁটতে শুরু করে সরকার। এ পর্যায়ে স্বাভাবিক নিয়মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। গত মাস পর্যন্তও এ প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। তবে সর্বশেষ এ সংশোধনের জন্য জোরালো উদাহরণ হিসেবে ভূমিকা রাখে কিছুদিন আগে জনপ্রিয় একটি ব্লগের এক কর্ণধারের বিকৃত ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনা। তার ছবির সাথে অন্য অশ্লীল ছবি জুড়ে দিয়ে একটি অসাধু চক্র প্রচার করলে তিনি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রতিকার চান। এরপরই ২০০৬ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া দ্রুত গতি লাভ করে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারী, বিশেষজ্ঞ ও আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়াই আইন সংশোধনের খসড়া তৈরি হয়। পরে তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পছন্দ অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কয়েকটি বৈঠক করা হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সরকারি টাস্কফোর্সের সবাইকে এ আইন সংশোধনের বিষয়টি অবহিত করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র মতে, মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একক তত্ত্বাবধানে আইন সংশোধনের খসড়া তৈরি করে মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়। মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেয়ার দিনেই পাঠানো হয় আইন মন্ত্রণালয়ে। আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শাখা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অধ্যাদেশ জারির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে তা স্বাক্ষর হয়ে ২১ আগস্ট গেজেট হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

সমালোচিত ধারা

৫৪ ধারার অপরাধ : কমপিউটার, কমপিউটার সিস্টেম বা কমপিউটার নেটওয়ার্কের মালিক অথবা জিম্মাদারের অনুমতি ছাড়া তার নথিতে থাকা তথ্য নষ্ট করা বা ফাইল থেকে তথ্য উদ্ধার বা সংগ্রহ করার জন্য কমপিউটার, কমপিউটার সিস্টেম ও নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা বা তা করতে অন্য কাউকে সহায়তা করা। কোনো উপাত্ত বা উপাত্তভাণ্ডার থেকে আংশিক তথ্য নিয়ে ব্যবহার করাকেও অপরাধ হিসেবে ধরা হয়েছে। কমপিউটারে ভাইরাস ছড়ানো বা ছড়ানোর চেষ্টা, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কমপিউটার বা নেটওয়ার্কের উপাত্তভাণ্ডারের ক্ষতিসাধন করা, অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি করে নেটওয়ার্কের বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা করার চেষ্টা, কমপিউটার নেটওয়ার্কে অবৈধ প্রবেশে সহায়তা করা, অনুমতি ছাড়া কোনো পণ্য বা সেবা বাজারজাত করা, অযাচিত ইলেকট্রনিক মেইল পাঠানো, কারসাজি করে কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বাবদ ধার্য চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করাও অজামিনযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

৫৬ ধারার অপরাধ : এ ধারায় কমপিউটার সিস্টেমের হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কমপিউটারের তথ্য নষ্ট, বাতিল বা পরিবর্তন করা অজামিনযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। মালিক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি না হয়ে কেউ কোনো কমপিউটার, সার্ভার, নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করে ক্ষতি করাও একই ধরনের অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৫৭ ধারার অপরাধ : ইলেকট্রনিক মাধ্যমে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ এ ধারায় গণ্য হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মিথ্যা ও অশ্লীল কিছু প্রকাশ করলে এবং এর কারণে মানহানি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগলে বা কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৬১ ধারার অপরাধ : সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ এ ধারার অন্যতম অপরাধ। সংরক্ষিত সিস্টেম হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির তাতে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এছাড়া আইনের ৭৬ (১) ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাবে না। যদি কোনো মামলার তদন্তের কোনো পর্যায়ে দেখা যায়, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রক বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাদের কাছ ▸

সংশোধিত আইনে সমালোচিত ইস্যু

২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ৬১ ধারায় উল্লিখিত অপরাধকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ চার ধারার অপরাধগুলো হলো– কমপিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধ, সিস্টেমে হ্যাকিং, সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ ও ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করা। খসড়ায় এ চার ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়েছে। আর ন্যূনতম শাস্তি হবে সাত বছর। গত ১৯ আগস্ট মন্ত্রিসভা সংশোধিত আইনের এ খসড়াটি অনুমোদন করে। আইনটি ভেটিংয়ের (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। আইনটির নাম হবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০১৩।

থেকে পুলিশ কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা প্রয়োজন, তবে সরকার বা ক্ষেত্রমতো সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদেশের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারবে।

মত-মতান্তর

তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধেই এ আইনের কয়েকটি ধারার অপরাধকে অজামিনযোগ্য করা হয়েছে এবং আমলযোগ্য অপরাধ কেউ করলে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতারের বিধান রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি যার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে তারও বিচার পাওয়ার এবং অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনার অধিকার রয়েছে। সে ক্ষেত্রে নন-কগনিজেবল বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা নেই। একইভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্য বিষয়টিও ঠিক আছে।

নজরুল ইসলাম খান

আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে জানিয়ে নজরুল ইসলাম খান বলেন, সংশোধনে আইনের মূল সংজ্ঞা, নির্দেশনার কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ১০ বছরের স্থলে ১৪ বছর ও সর্বনিম্ন শাস্তি ৭ বছর করা হয়েছে। এ ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে মামলা করতে পুলিশের পূর্ব অনুমোদন নেয়ার ব্যবস্থা ছিল, সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধকে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে 'উস্কানিমূলক বক্তব্য, মানহানিকর তথ্য কিংবা কুৎসা রটনা জাতীয় অস্বচ্ছ শব্দগুলো (যেগুলোর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া যায় না) সংযোজনের ব্যাপারে তিনি বলেন, এসব শব্দ থাকার অর্থ এই নয়, এর মাধ্যমে সমালোচনা করার অধিকার কিংবা স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব হবে। এ আইনের অপপ্রয়োগ হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ২১১ ধারা অনুযায়ী প্রতিকার চাওয়ার অধিকারও নাগরিকের থাকবে। আর সেখানে কোনো সংশয় থাকলে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির সংজ্ঞা অনুসরণ করলেই চলবে। তাই আলাদা করে সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন নেই। এজন্য পেনাল কোডই যথেষ্ট।

প্রতিক্রিয়া : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন সংশোধনের মাধ্যমে প্রযুক্তিতে সরকারের ডিজিটালবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি বিতর্কিত করেছে। এর কয়েকটি ধারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করেছে এবং জনমতে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে বলে মতপ্রকাশ করেছেন সুধীজনেরা। এ বিষয়ে সরকারকে তাড়াহুড়া না করে সর্বস্তরের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে আইনটি ফের সংশোধনেরও পরামর্শ দিয়েছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্টরা। অনলাইন সমাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কমিউনিটি ব্লগেও এ নিয়ে চলছে তির্যক সমালোচনা। পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতারের ক্ষমতা সভ্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয় অভিমত ব্যক্ত করে এরা প্রায় সবাই মনে করেন এ বিধান পরিমার্জন করা না হলে আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির উদ্দেশ্য নিয়ে জনমনে সন্দেহ বাড়বে। যে আইনে বাকস্বাধীনতা কিংবা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তা অবশ্যই অধ্যাদেশ জারি করে কার্যকর করা উচিত নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংবিধান প্রণেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, সংশোধিত ▸

তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের চোখে

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের অপরাধীদের শাস্তির চেয়ে এর সংজ্ঞায়ন, প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিতকরণ ও অপরাধীকে রুখে দেয়ার কৌশল উদ্ভাবনের দিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার দাবি জানিয়েছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবোদ্ধারা। তাদের মতে, শুধু আইন করলেই হবে না, এর অপব্যবহার রুখতে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে সরকারকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে। হয়রানি ও আইনের অপব্যবহার রুখতে সবার আগে স্থাপন করতে হবে আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব।

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, আইন করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। তবে দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাবে আইনের অপব্যবহার এবং হয়রানির শঙ্কা রয়েছে। ডিজিটাল অপরাধের মাধ্যমে অন্যকে ফাসিয়ে দেয়ার প্রবল সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এটি চিহ্নিত করা ও প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতা ও দক্ষ জনবল না থাকলে ডিজিটাল অপরাধের মাধ্যমে অন্যকে ফাসিয়ে দেয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি বরাবর দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এর একটি ডিজিটাল সিগনেচারের সাথে যুক্ত করে যে অপরাধ হচ্ছে তা শনাক্ত করা এবং সাইবার ক্রাইম প্রমাণের জন্য যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতা অর্জন। এ দুটি বিষয় নিশ্চিত করা না হলে এ আইন থেকে সুফল মিলবে না। সর্বোপরি শুধু নন-কগনিজেবল কিংবা নন-বেইলেবল বিধান যুক্ত করে আইনের কঠোরতা দেখানো হলেও প্রকৃত অর্থে এ আইন সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। এর বিধিবিধান স্পষ্ট ও যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্টদের অভিমত নিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ করে আইনটির সংশোধনী আনা উচিত ছিল। অধ্যাদেশ জারির বিষয়ে তড়িঘড়ি করাটা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আশা করি, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের এ আইন যেনো রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত না হয়। অপরাধের প্রকৃতি নিরুপণ ও তা প্রমাণের জন্য প্রশাসনকে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

বেসিস সভাপতি ফাহিম মাশরুর বলেন, প্রতিদিনই সাইবার অপরাধ হচ্ছে। নতুন কৌশলে সংঘটিত হচ্ছে এসব অপরাধ। এমন অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে যে আইনটি করা হয়, তা যেমন যথেষ্ট নয় তেমনি ২০১৩ সালে এসে হঠাৎ করে সংশোধনী করার আগে অনেক বিষয় ভাবার ছিল। কেননা আইনটি হালনাগাদ করতে এই সময়ে বিদ্যমান আইনের ব্যবহার ও প্রয়োগ আমরা দেখিনি। সম্প্রতি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমানের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলার পর বলতে গেলে বেশ তাড়াহুড়া করে আইনের সংশোধন আনা হলো। এখানে শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো আর জামিন অযোগ্য ও বিনা মামলায় গ্রেফতারের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখানো হলেও শুধু শাস্তির দিকে গুরুত্ব দেয়া বা অভিযোগ গ্রহণের বিষয়ে ফোকাস হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটি একটি টেকনিক্যাল বিষয়। তাই আইসিটি অপরাধের সংজ্ঞায়ন, কীভাবে ঘটছে কিংবা এর ব্যাপ্তি ও নিয়ত বদলে যাওয়া ক্রাইমের ধরন ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ ছিল সবচেয়ে জরুরি। এটা করা গেলে প্রচলিত আইনের আওতায়ও বিচার করা সম্ভব হতো। কিন্তু তা না করে এবং এ বিষয়ে জনমত যাচাই না করে সংশোধিত আইনের অধ্যাদেশ জারি করায় রাজনৈতিকভাবে এর অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধের ব্যাপ্তি নিরূপণ, বাস্তবে কী ধরনের অপরাধ হচ্ছে কিংবা তা নিরীক্ষা করেই আইনের সংশোধন করা দরকার ছিল। আর অপরাধ শনাক্তের জন্য আগেই আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা গেলে আইনের অপপ্রয়োগ রোধ করা সহজ হতো।

আইনটি অবশ্যই সংসদে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। অধ্যাদেশ জারির আগে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি যাচাই-বাছাই করে, সংসদে আবারও আলোচনা করে, প্রয়োজনে জনমত যাচাই করে করা উচিত ছিল। এখন আইনের সংশোধন এবং অধ্যাদেশ জারি উভয় বিষয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে নতুন করে সংযুক্ত ধারার সমালোচনা করে বিশিষ্ট আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, প্রতিনিয়ত আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছি। আইনে তথ্যের সংজ্ঞায় মিথ্যা, অশ্লীল ও উস্কানিমূলক– এ বিষয়গুলো স্পষ্ট করা নেই। ইন্টারনেটে সত্য ভেবে কোনো তথ্য আদান-প্রদান করা হলো, কিন্তু সেটাকে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মিথ্যা বা অশ্লীল বা উস্কানিমূলক বিবেচনা করে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে। ফলে ভয়ভীতির কারণে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই (১২ সেপ্টেম্বর) সংসদের অধিবেশন বসছে। অথচ সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার আগেই অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ধরনের একটি আইন সংশোধনে এভাবে তাড়াহুড়া করার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।

আইনটিকে একটি 'কালাকানুন' মন্তব্য করে তিনি বলেন, ওয়ারেন্ট ছাড়াই এভাবে পুলিশকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া সভ্য দেশের জন্য বেমানান। এ ধরনের সংশোধনী কার্যকর হলে সংবিধানপ্রদত্ত জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই এ সংশোধন যাতে না হয়, সেজন্য সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। জোরালো প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে নাগরিক সমাজকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গণমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকারকর্মী, তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী– সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে এ ধরনের আইন কাম্য হতে পারে না। যে কারও মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে এ আইনের প্রয়োগের চেয়ে অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকছে বেশি। সংসদ এখনও আছে, তা সত্ত্বেও এটি কেনো অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হলো, তাও এ আইন সংশোধন নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

একই বিষয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, একজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী বলা যায় না। তাই কোনো অপরাধকে বিচারের আগেই অজামিনযোগ্য বলে দেয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। অপরাধ অজামিনযোগ্য করে দেয়ার ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আইনের অপব্যবহার হতে পারে। তাই জামিন আদালতের সন্তুষ্টির ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

তিনি বলেন, আইনের জমিনযোগ্য ধারাগুলো অজামিনযোগ্য করে দেয়ায় মানুষ ভীত হবে। এছাড়া এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থীও। এর ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। আইনের কয়েকটি ধারা অজামিনযোগ্য করে দেয়ায় মানুষ ভীত হবে, এটা আসলেই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এর ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রথমত সুসভ্য কোনো আইনই জামিন অযোগ্য হতে পারে না। এটা সরাসরি মানবাধিকারের পরিপন্থী। আদালতের প্রতি বিশ্বাস থাকলে জামিনের বিষয়টি আদালতের ওপর ছেড়ে দেয়াটাই আইনের সঠিক অবস্থান।

তিনি বলেন, অধ্যাদেশ জরুরি প্রয়োজনে সরকার জারি করতে পারে, যেমন পাকিস্তান আমলে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ হিসেবে এসেছিল। কারণ, সে সময় সংসদে গেলে এটা পাস হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। সেপ্টেম্বরেই সংসদ বসছে। সেখানে আওয়ামী লীগের দুই-তৃতীয়াংশ আর মহাজোটের তিন-চতুর্থাংশ আসন আছে। তাহলে এ অধ্যাদেশ জারির প্রয়োজন হলো কেনো। এ অধ্যাদেশ জারি অবশ্যই অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানবাধিকার কর্মী ও হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এখন সর্বত্র। এটি এখন গণযোগাযোগের মাধ্যম। এ নিয়ে আইনকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজন আছে। তবে সংশোধনের আগে সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মীসহ সব মহলে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা ও মতামত ছাড়া এ আইন সংশোধন করা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চেতনাবিরোধী।

তিনি বলেন, এমনিতেই ৫৪ ধারায় পুলিশের গ্রেফতারের ক্ষমতা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। আর তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিষয়ে পুলিশকে এত বড় ক্ষমতা দেয়া সঠিক হয়নি। এছাড়া সংবিধানের ২৬ ধারায় বাকস্বাধীনতার কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধনে সেই বাকস্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ কারণে এ অধ্যাদেশটি উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এ ধরনের অধ্যাদেশ জারি করার আগে সরকারের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত নেয়া উচিত ছিল।

আইনজীবী তানজীব উল আলম বলেন, এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান-প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতার অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগে এ আইনে বাকস্বাধীনতায় এক ধরনের সুরক্ষা ছিল। কিন্তু অপরাধ আমলযোগ্য করার প্রস্তাব করায় সেই সুরক্ষা নষ্ট হবে। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশে ইন্টারনেটকে যোগাযোগমাধ্যম বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে কথায় কথায় শাস্তির বিধান রাখা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চেতনাবিরোধী।

তথ্যপ্রযুক্তি আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার আনীক আর হক বলেন, এখন তো এ অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে মতামত দেয়াও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল। যেকোনো মতামতকেই সরকার মানহানিকর কিংবা উস্কানিমূলক উল্লেখ করে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে। সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের ধারার সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে বিষয়টি উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলেও জানিয়েছেন আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকারকর্মীরা। তবে তথ্য ও যোগাযোগ সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, সংশোধনটি করা হয়েছে মূলত অনলাইনে অশ্লীল ছবি কিংবা ভিডিওচিত্র দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদাহানি রোধ করার জন্য। এ সংশোধন স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা হবে না বলেও মত দেন তিনি।

ব্লগার ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের (বোয়ান) আহ্বায়ক এবং গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার বলেন, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা অবশ্যই পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা, রুচিহীনতা, ব্ল্যাকমেইলিং, বিকৃত তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে; কিন্তু কখনই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধন সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে দেখা যাচ্ছে, আইনটিতে স্বাধীন মতপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত করার কিছু বিধান আছে। এর ফলে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, গণমাধ্যমের বিশ্লেষণসহ মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা খর্ব হবে। এ কারণে আইনের সংশোধন এবং অধ্যাদেশ কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

সংশোধিত আইনে সমালোচিত ইস্যু

২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ৬১ ধারায় উল্লিখিত অপরাধকে আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ চার ধারার অপরাধগুলো হলো– কমপিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধ, সিস্টেমে হ্যাকিং, সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ ও ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করা। খসড়ায় এ চার ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়েছে। আর ন্যূনতম শাস্তি হবে সাত বছর। গত ১৯ আগস্ট মন্ত্রিসভা সংশোধিত আইনের এ খসড়াটি অনুমোদন করে। আইনটি ভেটিংয়ের (পরীক্ষা-নিরীক্ষা) জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। আইনটির নাম হবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০১৩।

আশ্বাস মিলেছে সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের

তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের এ দাবি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ▸

মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারাও আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধবিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর (ফেসবুক, টুইটার) ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একই সাথে সাইবার অপরাধ তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে স্থাপন করা হচ্ছে 'আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব'। সূত্র মতে, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ল্যাব স্থাপন করা হবে। ইন্টারনেটে অপরাধ করলে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সেজন্য সাইবার অপরাধের বিচারের বিষয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। একই সাথে প্রণয়ন করা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন ও তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন। গঠন করা হচ্ছে সাইবার অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। জানা গেছে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভাপতি শেখ মো. ওয়াহিদ উজ জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সাইবার অপরাধের বিচারে ভ্রাম্যমাণ আদালত ব্যবহার করা, ইন্টারনেট গেটওয়েতে পর্নোসাইট ব্লক করা, সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা, আইসিটি ফরেনসিক ল্যাব নির্মাণ ও সাইবার সিকিউরিটি উইং খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ বলেন, অনেকেই ইন্টারনেটের সুযোগে নানাভাবে দেশ ও দেশের মানুষকে অসম্মান করছে। এর বাইরেও নানা ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। সাইবার অপরাধের বিচারের বিষয়টি ভ্রাম্যমাণ আদালতের শিডিউলভুক্ত না থাকায় এসব অপরাধীর দ্রুত বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে বিচারের ক্ষমতা ভ্রাম্যমাণ আদালতে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে কোনো মতেই যাতে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার অপব্যবহার না হয়, সেজন্য সরকার সবসময়ই সতর্ক থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশে সাইবার অপরাধী চিহ্নিত করার কোনো ফরেনসিক ল্যাব নেই। ফলে অনেক সময়ই অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় না। তাই কোরিয়া সরকারের সহযোগিতায় এ ধরনের ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে কত দিনের মধ্যে ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

তিনি আরও জানান, সাইবার অপরাধ রোধে বাংলাদেশ কমপিউটার সিকিউরিটি রেসপন্স টিম (বিডি-ক্রিস্ট) নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ সাইবার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ, ব্লক প্রতিহতকরণ এবং যেকোনো হোস্টেড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট পর্যবেক্ষণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সমাজব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রম পরিচালনার ওপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ রেখে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

> অপরদিকে সাইবার স্পেস ও ইন্টারনেটভিত্তিক সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহত করতে সব ধরনের তথ্য দেয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা উপাত্ত লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কমপিউটার সিকিউরিটি রেসপন্স টিম (বিডি-ক্রিস্ট) নামে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তথা বিটিআরসি।

একই বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, দেশে সাইবার অপরাধ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন' প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ গাইডলাইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। ইংরেজিতে তৈরি ওই খসড়াটি বাংলায় অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমীতে পাঠানো হয়েছে। অনুবাদ পাওয়া গেলে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি জানান, দেশের সাইবার অপরাধগুলোর ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য কোনো নীতিমালা নেই। এ সংক্রান্ত কোনো স্থাপনাও এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে সাইবার অপরাধ তদন্ত করে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল তথা বিসিসি একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্যে কোরিয়ার কেআইএসএ এবং বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

এদিকে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাইবার কমপিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমের (সিসিএ) অধীনে সাইবার সিকিউরিটি উইং নামে একটি আলাদা শাখা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সাথে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রণয়ন করে তা দ্রুত মন্ত্রিসভায় পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে। তবে সাইবার অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করতে বিষয়টি এখনও ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে শিডিউলভুক্ত করা হয়নি।

অপরদিকে সাইবার স্পেস ও ইন্টারনেটভিত্তিক সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহত করতে সব ধরনের তথ্য দেয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা উপাত্ত লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ কমপিউটার সিকিউরিটি রেসপন্স টিম (বিডি-ক্রিস্ট) নামে একটি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তথা বিটিআরসি। তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ও তথ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রণয়নসহ অন্যান্য সরকারি ওয়েবসাইটের ঝুঁকি চিহ্নিত করা হবে। একই সাথে বিডি-ক্রিস্টকে ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত তথ্য লেনদেন ও কারিগরি সহযোগিতা বিনিময় করা হবে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইন এশিয়া-প্যাসিফিক (এপসের্ট), অর্গানাইজেশন অব দ্য ইসলামী কো-অপারেশন-কমপিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমস (ওআইসি-সের্ট) ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) প্রতিষ্ঠান ইমপ্যাক্টের সাথে। সহজেই পর্নোসাইট দেখার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই সহজেই যাতে পর্নোসাইট দেখা না যায়, সেজন্য তা নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি। আগামী দুই মাসের মধ্যে ইন্টারনেট গেটওয়েতে পর্নোসাইট ব্লক করা হবে বলে বিটিআরসি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

শেষ কথা

সন্দেহ নেই, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সাইবার অপরাধ আগের চেয়ে তুলনামূলক বেড়েছে। এটা ঠিক, আইনী পরিকাঠামোর আওতায় এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে জনগণের মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই এ সংক্রান্ত আইন তৈরি বা এর সংশোধনীর পর আইনটির চেহারায় কিছু অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার চেয়ে আইনটি সামাজিক মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে থাকা পুরা অনলাইন সমাজকে যেনো নিয়ন্ত্রণ করতেই অপেক্ষা করছে।

বস্তুত, প্রথাগত মূলধারার গণমাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ একমুখী। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমগুলোতে দ্বিমুখী পদ্ধতিতে মানুষ পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া ঘটাচ্ছে। মানুষের এ পারস্পরিক যোগাযোগ মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্ম দেয়। বিশ্বব্যাপী শাসকেরা তাই এ স্বাধীন মিথস্ক্রিয়াকে ভয় পেয়ে নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। তথ্যপ্রযুক্তি আইনে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা দেখে এমন মনে করাই স্বাভাবিক। কেননা তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধনীটি শুধু মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারই প্রশ্নবিদ্ধ করেনি, ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন চর্চাকেও বাধাগ্রস্ত করছে। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সাথে সাংঘর্ষিক হবে কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com